তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মাহবুব হাসান

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট কি সত্যিই অতিরঞ্জন

গত ৩ জানুয়ারি রাজধানীর স্কুলগুলো খুলছে। ছেলেমেয়েরা ক্লাসে গেছে খালি হাতে। শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞেস করেছে শিক্ষকদের কাছে বই পাওয়া যাবে কবে। তারা কোনও উত্তর দিতে পারেননি। কোনও কোনও শিক্ষক বলেছেন, পুরনো বই সংগ্রহ করে পড়াশোনা শুরু কর। বই এসে যাবে।

শোনা যাচ্ছে, এ বছর থেকে নতুন বই দেয়া হবে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত। পত্রিকায় পড়েছি যে, নতুন বই দেবে বোর্ড। শিক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে বইয়ের জন্য। তারা বাবা-মাকে তাগিদ দিচ্ছে বই কিনে দেয়ার জন্য। বাবা-মা ছুটছেন বইয়ের দোকানে। দোকানিরা চালাকি করছে। বলছে, পুরনো বই চলবে। অর্থাৎ স্টকে থাকা বইয়ের লট বিক্রির জন্য তারা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। বই বদলে যাবে- এ তথ্যই তারা স্বীকার করছে না। এতে অভিভাবকরা পড়ছেন বেকায়দায়। তারা পত্রিকায় পড়ছেন নতুন বই আসছে। দোকানি বলছে দেরি হবে। ছাপার কাজ চলছে। যারা মুদ্রণের দায়িত্ব পেয়েছিল টেন্ডারে, তারা ব্যর্থ হয়েছে বই মুদ্রণ, সরবরাহ করতে। পত্রিকায় প্রায়শই সে সংবাদ আমরা পড়ছি। আবার এ কথাই পত্রিকায় পড়ছি যে, মন্ত্রী-সচিব, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মুদ্রক দাবি করেছেন ক্লাস শুরু হলেই শিক্ষার্থীরা বই পাবে। ক্লাস শুরু হয়েছে, বই পৌঁছায়নি ছেলেমেয়েদের হাতে।

কথা বলা সহজ, রক্ষা করা সহজ নয়। দাবি করা, অঙ্গীকার করাও সহজ এবং রাজনীতিকদের স্বভাবজাত। তারা দাবি, অঙ্গীকার করেন যখন তখন, যত্রতত্র, তরতরিয়ে- মুখে একটুও আটকায় না। বলে দিয়েছিলেন স্কুল খোলার দিন বই পাবে শিক্ষার্থীরা। পায়নি তারা। মুদ্রকের আঁতুড় ঘরেই রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বই।

তাহলে কেন তারা বলেছিলেন যে, স্কুল খোলার দিনই বই পাবে ছাত্রছাত্রীরা? গত ৩ জানুয়ারি যে শিক্ষার্থীরা বই পেল না, এ নিয়ে কোন খেদ কি কথা দেনেঅলাদের মনে জমেছে? নাকি তাদের মনে ওই মানবিক বোধের জন্ম হয় না? তারা কি খেদহীন, নিরেট মানুষ? যাদের মানুষ বলতে গেলে পুরো মানুষের যোগ্যতায় ফেলা যায় না?

যাদের মনে কোন কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হলেও ব্যর্থতার বেদনা জন্ম নেয় না- তাদের কি বলে চিত্রিত করা যায়- সে শব্দটি এখন আর মনে পড়ছে না। তবে যারা শিক্ষার্থীদের জন্য কিংবা ধরা যাক- পাবলিককে পাক্কা কথা দেন, অঙ্গীকার করেন এবং তা প্রতিনিয়তই ভেঙে ফেলেন, তাদের হয়তো বলা যায় বেহায়া। পটুয়া কামরুল হাসান সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদকে খেতাব দিয়েছিলেন 'বিশ্ব-বেহায়া'। এতবার অঙ্গীকার ভেঙেছিলেন এরশাদ যে, শেষ পর্যন্ত ওই খেতাবেই তিনি 'মানানসই' হলেন। আর যারা অঙ্গীকার দিয়ে ভাঙেন এবং জোরগলায় দাবি করেন যে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট নেই- সেই সাবেক আমলা (এরশাদীয় আমলেও তিনি ছিলেন তার সহযোগী) বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আমরা তো কোন 'কূট' কথায় তিক্ত করে তুলতে পারি না। আফটার অল- তিনি একজন সুশিক্ষিত মানুষ এবং সুশীল সমাজের 'পতি'দের একজন। তিনি কি মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিতে পারেন? না পারেন না। সেটাই আমরা বিশ্বাস করি।

কিন্তু ৩ জানুয়ারির যুগান্তরে পড়লাম তিনি অস্বীকার করেছেন পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের কথা। গত মঙ্গলবার ২ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তিনি বলেছেন বই সঙ্কট নেই। তিনি এবং তার মন্ত্রণালয়ের সচিব দাবি করেছেন, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য মজুদ পৌনে দুই কোটি বই পাঠানো হয়েছে। আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সব ছাত্রছাত্রীর হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দেয়া তথ্য অনুযায়ী অনুমান করা যায় যে, বোর্ডের হাতে প্রাথমিক স্কুলের পৌনে দুই কোটি বই ছিল। সে বই স্কুলগুলোতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ও সত্য হচ্ছে ঢাকা শহরের বড় এবং নামী একটি স্কুলেও এখনও কেন বই পৌঁছায়নি? মতিঝিল থেকে সিদ্ধেশ্বরী বা মতিঝিল কলোনি এলাকার স্কুলগুলোতে বই পৌঁছাতে কতক্ষণ বা কতঘণ্টা বা কতদিন সময় লাগতে পারে? শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয় তা জানবেন। কিংবা জানবেন না যদি তার বাস্তব বুদ্ধি না থাকে। তথ্য হিসাবে পত্রিকায় এসেছে যে, চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুস্তকের প্রয়োজন সাড়ে তিন কোটির মতো। হাতে যদি পৌনে দুই কোটি বই থেকে থাকে, তাহলে বাদবাকি সোয়া কোটি বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ কি এতটাই সময়সাপেক্ষ? পুস্তকা, ফ্রি-প্রেস ও শুকতারা বেক্সিমকোর এই তিনটি প্রতিষ্ঠান কেন গত দুই মাসেও সোয়া কোটি বই ছেপে বাঁধাই করে সরবরাহ করতে পারেনি? আর মাধ্যমিক শ্রেণীর পুস্তক মুদ্রণের সংখ্যা ৫ কোটির মতো। সেই পুস্তকও মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করার দায়িত্ব পেয়েছে ওই তিন প্রতিষ্ঠানই। অর্থাৎ বেক্সিমকোকেই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সব দায়দায়িত্ব দিয়েছে বোর্ড। ফলে, তাদের দাবি অনুযায়ী সরকারের কিংবা বোর্ড কর্তৃপক্ষের বেঁচে যাবে ৩৬ কোটি টাকা। আর এর বিনিময়ে শিক্ষামন্ত্রীর কোন ক্ষতি না হলেও ক্ষতি হবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। সে কথা শিক্ষামন্ত্রীর মনে থাকে বলে মনে হয় না। থাকলে জলজ্যান্ত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের কথা অস্বীকার করলেন কিভাবে তিনি? এবং সেই অস্বীকার করার কথাটা বেহায়ার মতো শোনাচ্ছে। যুগান্তরের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেলো বিনা টেন্ডারে শতাধিক প্রেসকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ দিয়েছে বোর্ড। বেক্সিমকো'র সম্মান বাঁচাতে নাকি নিজেদের দুরভিসন্ধি লুকাতে তারা এ পথ নিয়েছেন? কিন্তু ক্ষতি যা হবার তাতো হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

কথায় বলে, 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'। বেক্সিমকোর ওই তিন প্রতিষ্ঠান যখন দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহ করতে পারেনি, তখন মন্ত্রণালয় থেকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে। বোর্ড মন্ত্রণালয়ের সে নির্দেশ মানেনি বা বাস্তবায়ন করেনি।

আবার ৩ জানুয়ারি পত্রিকায় পড়লাম, শিক্ষা সচিব দাবি করেছেন, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট নিয়ে পত্রপত্রিকায় অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। যারা পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ পায়নি তারাই এ সব ভুল তথ্য সংবাদপত্রে দিচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত হলে যা হয়, শিক্ষা সচিবের এই দাবি তাই প্রমাণ করছে। তার কথা কেবল মিথ্যাই নয়, প্রকৃত সত্যকেও অস্বীকার করছে। প্রথমত, পত্রিকাগুলোতে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট নিয়ে যে সব তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট বেরিয়েছে, তার কোন তথ্যই বানোয়াট প্রমাণ করতে পারবেন না শিক্ষা সচিব। কম দরে বেক্সিমকোকে কাজ দেয়া হয়েছে, এ নিয়ে কোন পত্রিকা কটূক্তি করেনি। পত্রিকাগুলো শঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, বোর্ডের গাফিলতির ফলে ওই প্রতিষ্ঠান তিনটিকে অনেক দেরিতে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এদের অতীত অভিজ্ঞতা নেই। তাই শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বই দিতে পারছে না তারা। তৃতীয়ত, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে কাগজ ছিল না বিধায় মুদ্রণকারীকে চীন, কোরিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে শেষ মুহূর্তে কাগজ আমদানি করতে হয়েছে। এ সব দায়-দায়িত্ব বোর্ডের। পত্রিকাগুলো সে কথাই তুলে ধরেছে।

শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব, এখন সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরও কি করে বলেন যে, যথাসময়ে শিক্ষার্থীরা বই পেয়ে যাবে? ৩১ জানুয়ারি কি শিক্ষা বৎসরের শুরুর সময়, নাকি ১ জানুয়ারি? স্কুলগুলো ৩ জানুয়ারি খুলেছে অথচ শিক্ষার্থীরা বই পায়নি। এই কথাটা পাঠকদের তুলে ধরাটাই কি শিক্ষা সচিবের কাছে 'অতিরঞ্জিত' মনে হয়েছে?

তাহলে শিক্ষা সচিবের 'অতিরঞ্জনের' দুটি সত্য তথ্য উপস্থাপন করা যাক। 'আলোকিত জয়পুরহাট ও গাজীপুর' নিয়ে যুগান্তরে দুটি রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে ইতোপূর্বে। সে সময় ঘোষণা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী, সচিব জানিয়েছিলেন যে, ওই দুটি জেলা নিরক্ষরমুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ জেলা দুটির সব মানুষই সাক্ষর অর্থাৎ নামদস্তখত করতে শিখেছে। প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধনও করা হয় । আলোকিত জয়পুরহাট ও গাজীপুর-এর এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠান। কিন্তু তারপর প্রমাণ হয়ে গেছে যে, 'করিৎকর্মা' সাজতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব অতিরঞ্জন কেবল করেননি তথ্যের তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করেছেন। এই প্রতারণা জাতির সঙ্গে করেও শিক্ষা সচিবের খায়েশ কমেনি, তারা লজ্জিতও হননি। তিনি মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বর্তমান সরকারকেও বেকায়দায় ফেলছেন। ওই দুটি জেলার ঘটনা যেমন সত্য তেমনি এখন যে তিনি ও তার মন্ত্রী পুস্তক সঙ্কটের কথা অস্বীকার করছেন, সেটাও আরেকটি সঙ্কট সৃষ্টি করবে। কেননা, দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা দেখছেন, জানছেন, ভোগ করছেন পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট। অথচ মন্ত্রী-সচিব দিব্যি দাবি করছেন পাঠ্যপুস্তকের কোন সঙ্কট নেই। এটা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল নয় কি?

কেবল রাজনীতির জন্য মিথ্যাচার যেমন জাতির জন্য ক্ষতিকর, তেমনি ব্যক্তির জন্যও ক্ষতির কারণ। শিক্ষিত স্বজনদের কাছে জাতির সচেতন মানুষ, যারা সুশীল সমাজের সদস্য বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন তারা ন্যায় প্রত্যাশা করেন। যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর (যদিও শিক্ষা সচিবের দাবি হচ্ছে ৬২% মানুষ সাক্ষর) তারা শিক্ষামন্ত্রী বা সচিবের এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না। কেননা, নিরক্ষর কৃষক শিক্ষিত জ্ঞানীদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে বাম্পার ফসলের অধিকারী হলেও, তার প্রকৃত দাবিদার হচ্ছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা। রাজনীতিকদের কথা শুনলে মনে হবে এই মাত্র ফসলের মাঠে পানির সেচ দিয়ে, স্কুলে স্কুলে পড়িয়ে তারা রাজধানীতে ফিরে এলেন। এই চেতনা ও এই ব্যবহার পরিত্যাগ করতে হবে তাদের। না হলে, সাধারণ মানুষ হয়তো তাদের আর বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে গণ্য করবে না।

শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব, এখন সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরও কি করে বলেন যে, যথাসময়ে শিক্ষার্থীরা বই পেয়ে যাবে? ৩১ জানুয়ারি কি শিক্ষা বৎসরের শুরুর সময়, নাকি ১ জানুয়ারি? স্কুলগুলো ৩ জানুয়ারি খুলেছে অথচ শিক্ষার্থীরা বই পায়নি। এই কথাটা পাঠকদের তুলে ধরাটাই কি শিক্ষা সচিবের কাছে 'অতিরঞ্জিত' মনে হয়েছে?